বাঙলার
শিকার-প্রাণী

বাংলার শিকার-প্রাণী

শ্রীশচীন্দ্রনাথ মিত্র

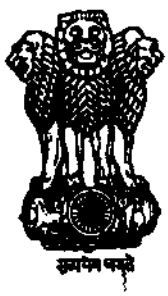

পশ্চিমবঙ্গ সরকারের
প্রচারবিভাগ কর্তৃক
প্রকাশিত

পশ্চিমবঙ্গ সরকারী মুদ্রণে
মুদ্রিত

মূল্য তিন টাকা

মস্তক ও পুচ্ছসমেত ইহার দৈর্ঘ্য প্রায় সাত ফুট, তন্মধ্যে পুচ্ছ প্রায় তিন ফুট; সম্মুখের পদতল হইতে স্কন্ধশীর্ষের উচ্চতা দুই হাত। লোম ঘন ও লম্বা। পৃষ্ঠদেশের সাধারণ বর্ণ ঈষৎ পীতাভযুক্ত ম্লান শ্বেতাভ ধূসর; তলদেশ শ্বেত। সর্বত্র কৃষ্ণবর্ণের দাগ, দাগগুলি অসমান; পৃষ্ঠ, পার্শ্ব ও পুচ্ছদেশের দাগ অপেক্ষাকৃত বড় এবং তাহাদের মধ্যভাগ ম্লান; মস্তক ও প্রতঙ্গের দাগ সম্পূর্ণ কৃষ্ণ; উদর দেশের দাগ সংখ্যায় কম ও অস্পষ্ট। কর্ণ কৃষ্ণ এবং প্রত্যেক কর্ণে একটি বড় পীতাভ দাগ বর্তমান।

ইহাদের খাদ্য বন্যছাগল, পক্ষী ইত্যাদি। চিতাবাঘের ন্যায় ইহারাও গ্রাম্য ছাগল, ভেড়া, কুকুর ইত্যাদি শিকার করিয়া আহার করে, কদাচিৎ অশ্বকেও আক্রমণ করে। ইহারা মনুষ্যকে আক্রমণ করিয়াছে বলিয়া কখনও শুনা যায় নাই। দার্জিলিঙে লোমব্যবসায়ীদের দোকানে ইহার ছাল প্রায়ই দেখা যায়। অত্যন্ত বিরল বলিয়া ইহার সংরক্ষণ বাঞ্ছনীয়।

(৩৭) **হস্তী** [*Elephas maximus indicus* G. Cuvier]

উত্তরবঙ্গে হিমালয়ের পাদদেশস্থ জঙ্গলসমূহে ইহাকে দেখা যায়, ইদানীং তিস্তানদীর পশ্চিমে কদাচিৎ ইহার দর্শন পাওয়া যায়। চট্টগ্রাম ও তাহার পার্বত্য অঞ্চলের অরণ্যে অদ্যাপি প্রচুর। মেদিনীপুর ও মৈমনসিং জেলায় কদাচিৎ দেখা যায়। বঙ্গদেশের অন্য কোথাও বন্যহস্তী নাই।

অধুনা জগতে যতপ্রকার ভূচর স্তন্যপায়ী প্রাণী আছে, তাহাদের মধ্যে হস্তীই আয়তনে বৃহত্তম। গৃহপালিত পশু হিসাবে ইহা এত সুপরিচিত যে, ইহার বিস্তারিত দৈহিক বিবরণ নিষ্প্রয়োজন।

পুরুষ হস্তীর স্কন্ধশীর্ষের উচ্চতা সাধারণত নয় ফুট এবং হস্তিনীর আট ফুট হয়; তবে, ইহা অপেক্ষা বৃহদাকার হস্তীও দেখা গিয়াছে। লক্ষ্য করিবার বিষয় যে, হস্তীর উচ্চতা তাহার সম্মুখস্থ পদতলের পরিধির ঠিক দ্বিগুণ। একটি পূর্ণবয়স্ক হস্তীর উচ্চতম ওজন প্রায় চার টন, আর একটি হস্তিনীর ওজন গড়পড়তা প্রায় ২½ টন।

পুরুষ হস্তীর সচরাচর দুইটি, কদাচিৎ একটি গজদন্ত থাকে, একটি থাকিলে তাহাকে 'গণেশ' বলে; কোন কোন হস্তীর গজদন্ত অঙ্কুরাবস্থায় থাকে—কখনও বর্ধিত হয় না; এইরূপ হস্তীর সাধারণ নাম 'মাকনা'। বৃদ্ধা হস্তিনীদের 'ঢোই' আর যুবতীদের 'সারিন' বলা হয়। হস্তিনীরও দন্ত মাকনার দন্তের ন্যায় অঙ্কুরাবস্থায় থাকে। গজদন্ত আট ফুট পর্যন্ত লম্বা হইতে দেখা গিয়াছে। এদেশের হস্তীর একজোড়া গজদন্তের ওজন সাধারণত ৩০ সের, কিন্তু কোন কোন ক্ষেত্রে ১০০ সের পর্যন্ত হইতে দেখা গিয়াছে।

সাধারণত সকল পুরুষ ও স্ত্রী হস্তীর সম্মুখের পদে পাঁচটি এবং পশ্চাতের পদে চারটি নখর থাকে। প্রত্যেক পদের দুই পার্শ্বের বহিঃস্থ নখর দুটি অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র এবং কতকটা কুণ্ঠিত; এই নখরগুলির চিহ্ন কেবল সিক্ত ভূমিতে অঙ্কিত হয়; সচরাচর ইহার গমনপথে কেবল তিনটির চিহ্ন পড়ে।

ইহাদের গাত্রবর্ণ ধূসরাভ কৃষ্ণ, কর্ণ, কপাল ও বক্ষোদেশে প্রায়ই কতকগুলি মাংস বর্ণের দাগ থাকে।

কয়েক বৎসর পূর্ব পর্যন্ত এক এক দলে ৫০-৬০টা বা ততোধিক হস্তী দেখা যাইত। আজকাল উত্তরবঙ্গে এক দলে সচরাচর তিন হইতে সাতটি এবং চট্টগ্রাম অঞ্চলে সাত হইতে ২০টি পর্যন্ত দেখা যায়। প্রত্যেক দলে সর্বদা একটি বৃদ্ধা হস্তিনীকে নেতৃত্ব করিতে দেখা যায়; ইহার কখনও অন্যথা হয় না। সাধারণত একই গোষ্ঠীর দুই-তিন বা চার পুরুষের বংশধরদের লইয়া এক-একটি দল গঠিত হয়। পূর্ণবয়স্ক পুরুষ হস্তীরা সচরাচর দল হইতে কতকটা দূরে দূরে থাকে, কিন্তু মধ্যে মধ্যে দলের সহিত মিলিত হয়।

উচ্চ বৃক্ষের বন অথবা উচ্চ তৃণবন হস্তীর সাধারণ বিচরণক্ষেত্র। বাঁশ, পুরুণ্ডি এবং বন্যকদলীতে সমাকীর্ণ জঙ্গল ইহাদের বিশেষ প্রিয়। আহার করিবার সময় ইহারা ছত্রভঙ্গ হইয়া পড়ে, কিন্তু ভয়ের কিঞ্চিৎ মাত্র কারণ উপস্থিত হইলেই তৎক্ষণাৎ একস্থানে জমা হয়। ইহারা অত্যন্ত চঞ্চল, মাত্র মধ্যাহ্নে এবং মধ্যরাত্রে অল্পক্ষণের জন্যে স্থির হইয়া থাকে। ইহারা ইতস্তত বিচরণ করিতে করিতে তৃণ, বিভিন্ন লতা ও অন্যান্য উদ্ভিদের পাতা ও ডালপালা, কলা, ডুমুর, চালতা ও অন্যান্য ফল অহোরাত্র আহার করে। একটি পূর্ণবয়স্ক হস্তী দিনে প্রায় আট মণ উদ্ভিজ্জ দ্রব্য ভক্ষণ করে। সময়ে সময়ে ইহারা গ্রামস্থ ধানক্ষেতে এবং বনমধ্যস্থ চারাগাছের বাগানে প্রবেশ করিয়া প্রভূত ক্ষতি করে।

ইহারা স্নান ও জলকেলী করিতে ভালবাসে; কর্দমাক্ত জলাতে, বিশেষত গ্রীষ্মকালে, গড়াগড়ি দেয়; শুণ্ডদ্বারা শুষ্ক মাটি তুলিয়া নিজদেহে ছড়ায়; আবার এইরূপে নিজগাত্রে জলও ছিটায়;

জল না পাইলে মুখমধ্যে শুণ্ড প্রবেশ করাইয়া নিষ্ঠীবন সংগ্রহ করিয়া তাহা গাত্রোপরি ছিটায়। বন্য হস্তী সাধারণত দিনে দুইবার জল পান করে, পিচকারি ভর্তি করিবার মত শুণ্ডমধ্যে এক হইতে দুই ফুট পর্যন্ত জল টানিয়া লয় এবং পরে মুখ-গহ্বরে শুণ্ড প্রবেশ করাইয়া সেই জল সজোরে নির্গত করে।

ইহারা রাত্রিকালে গ্রাম্য প্রান্তর, কৃষিক্ষেত্রাদি পার হইয়া এক জঙ্গল হইতে অন্য জঙ্গলেও যায়। উপযুক্ত বিচরণভূমির সন্ধানে ইহারা ঋতুভেদে সুদীর্ঘ পথ অতিক্রম করিয়া একস্থান হইতে স্থানান্তরে, এমনকি একদেশ হইতে দেশান্তরে গমন করে। এইরূপে জলপাইগুড়ি জেলার জঙ্গল হইতে কতক কতক হস্তী সময়বিশেষে উত্তরে ভুটান এবং পূর্বে আসাম অঞ্চলে চলিয়া যায় আবার তথা হইতে প্রত্যাগমন করে। চট্টগ্রাম অঞ্চলেও হস্তীকে ঋতু-ভেদে উত্তরে আসাম ও পূর্বে বর্মাদেশে গমনাগমন করিতে দেখা যায়। শত সহস্র শতাব্দী যাবৎ এইরূপ গমনাগমন নির্দিষ্ট পথ ধরিয়া চলিতেছে বলিয়া ঐসকল পথ সুচিহ্নিত। ভ্রমণের সময় ইহারা একটির পশ্চাতে একটি করিয়া সারি বাঁধিয়া ঐসকল সুচিহ্নিত গমনপথ অনুসরণ করিয়া চলে; সারির প্রথমে দলনেত্রী 'ঢোই' আর সর্ব পশ্চাতে দন্তীরা থাকে। হস্তী সাধারণত মৃদুগতিতে চলে, কিন্তু ভয় পাইলে বা উত্তেজিত হইলে ঘণ্টায় ২০ মাইল বেগেও দৌড়াইতে পারে। গুরুভার দেহ সত্ত্বেও, ইহারা উচ্চ পাহাড় আরোহণ এবং সন্তরণ করিতে বিশেষ দক্ষ।

প্রধানত গ্রীষ্মকালই ইহার সঙ্গমের ঋতু। গর্ভ-ধারণের কাল প্রায় ২০ মাস। হস্তিনী সাধারণত সেপ্টেম্বর হইতে নবেম্বর মাসের মধ্যে এককালীন একটি শাবক প্রসব করে। সদ্যোজাত শিশুর স্কন্ধ-দেশের উচ্চতা প্রায় দুই ফুট ১০ ইঞ্চি; জন্মের পর কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই ইহা হাঁটিতে পারে এবং ছয় মাস পর্যন্ত কেবলমাত্র মাতৃদুগ্ধ পান করে, তৎপরে তৃণ আহার করিতে আরম্ভ করে। ২৫ বৎসর বয়সে হস্তী পূর্ণাবস্থা প্রাপ্ত হয় এবং ১৫০ বৎসর পর্যন্ত জীবিত থাকে বলিয়া কথিত আছে। গৃহপালিত হস্তীকে ১০০ বৎসরের উপর পর্যন্ত জীবিত থাকিতে দেখা গিয়াছে। পূর্ণবয়স্ক পুরুষ হস্তী নির্দিষ্ট কাল অন্তর মত্ত বা 'পাগ্‌লা' হয়, এই সময় উহার কপালের রন্ধ্রসমূহ হইতে একপ্রকার রস নিষ্ক্রান্ত হইতে দেখা যায় এবং তখন উহার নিকটে যাওয়া বিপজ্জনক।

হস্তী সাধারণত, বিশেষত দলবদ্ধ থাকিলে, অতি নিরীহ এবং মনুষ্যের সাড়া পাইলে দূর হইতে সরিয়া যায়। কিন্তু যেসকল হস্তী দল ছাড়িয়া একাকী বিচরণ করে, তাহারা মনুষ্য দেখিলে প্রায়ই আক্রমণ করিতে উদ্যত হয় এবং কখন কখন গ্রামে প্রবেশ করিয়া অত্যাচার করে; সচরাচর এইরূপ 'গুণ্ডা' হস্তীরই কবলে পড়িয়া কখনও কখনও মনুষ্য প্রাণ হারায়। ১৯৩০-৩১ হইতে ১৯৩৯-৪০ পর্যন্ত দশ বৎসরের হিসাব হইতে দেখা যায় যে, বঙ্গদেশে প্রতি বৎসর গড়ে ১৩ জন লোক হস্তী দ্বারা নিহত হইয়াছিল।

হস্তী মূল্যবান প্রাণী বলিয়া একটি বিশেষ নিখিল ভারতীয় আইন [১৮৭৯ সালের (৬ষ্ঠ) হস্তী-সংরক্ষণ আইন] দ্বারা ইহার পূর্ণ সংরক্ষণের ব্যবস্থা আছে। মধ্যে মধ্যে 'খেদা' করিয়া বা অন্য উপায়ে অনেক হস্তী ধরা হয় এবং কোন গুণ্ডা হস্তী যদি কখন মনুষ্য বা সম্পত্তিনাশের কারণ হয়, তখন তাহাকে হত্যা করিবার জন্য পুরস্কার ঘোষণা করা হয়, কিম্বা কোন কোন স্থানে বেতনভোগী শিকারী নিযুক্ত করা হয়। এইসকল কারণে হস্তীর সংখ্যা কোনস্থানে অত্যধিক বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয় না।

মোটর গাড়ির প্রচলন বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে হস্তীর চাহিদা ও মূল্য সম্প্রতি অত্যন্ত কমিয়া গিয়াছে। তথাপি ১৯৩০-৩১ হইতে ১৯৩৯-৪০ পর্যন্ত দশ বৎসরে মোট ৫৪৬টি বন্যহস্তী ধৃত ও ব্যবহৃত হইয়াছে। ইহা হইতে বুঝা যায় যে, গৃহপালিত পশু হিসাবে হস্তীর উপকারিতা এখনও যথেষ্ট আছে।

(৩৮) **এক-শৃঙ্গ গণ্ডার** [*Rhinoceros unicornis* Linn.]

ইহাকে জলপাইগুড়ি জেলায় সংকোষ, বালা, তোর্সা এবং মূর্তি, এই চারিটি নদীর পার্শ্ববর্তী জঙ্গলে স্থানে স্থানে দেখা যায়। বর্তমানে মোটের উপর ৪০-৫০টি আছে। কোচবিহারে তোর্সা নদীর পার্শ্ববর্তী জঙ্গলেও গুটিকয়েক আজও টিকিয়া আছে। সম্ভবত চট্টগ্রাম পার্বত্য অঞ্চলস্থ সংপু জঙ্গলেও গুটিকতক আছে, কিন্তু তাহার সঠিক প্রমাণ নাই। আজকাল বঙ্গদেশের অন্যত্র কোথাও ইহার আর অস্তিত্ব নাই। কিন্তু নেপালে ও আসাম রাজ্যে এখনও ইহা অধিকতর সংখ্যায় বর্তমান বলিয়া কথিত।

ইহার দেহের দৈর্ঘ্য প্রায় ১০½ ফুট, পুচ্ছের দৈর্ঘ্য প্রায় ২½ ফুট, স্কন্ধশীর্ষের উচ্চতা ৫½ ফুট, ও

স্কন্ধের অব্যবহিত পশ্চাদস্থ দেহের উচ্চতম পরিধি ৯½ ফুট।

ইহার গাত্রবর্ণ কৃষ্ণাভ ধূসর, কপাল স্পষ্টত নতোদর। পুরুষ ও স্ত্রী উভয়েরই একটি স্থায়ী ও ক্রমবর্ধমান শৃঙ্গ থাকে। শৃঙ্গ এক ফুট পর্যন্ত দীর্ঘ ও ওজনে প্রায় তিন সের হয়। শৃঙ্গ জন্মাবধি ধীরে ধীরে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়, কোনরূপে নষ্ট হইলে পুনরায় নতুন শৃঙ্গ অঙ্কুরিত হয়। স্ত্রীর শৃঙ্গ অপেক্ষাকৃত অধিক দীর্ঘ ও তীক্ষ্ণ; পরস্পরের সহিত যুদ্ধের ফলে পুরুষের শৃঙ্গ সচরাচর ক্ষুদ্র ও ভোঁতা হয়; এই প্রভেদ দেখিয়া পুরুষ ও স্ত্রী-গণ্ডারের পার্থক্য বুঝা যায়।

কেবলমাত্র কর্ণ ও পুচ্ছে অল্পবিস্তর লোম থাকে। গাত্রচর্মে কতকগুলি গভীর ও সুস্পষ্ট ভাঁজ থাকে, (বিশেষত উরুর সম্মুখে, স্কন্ধের পশ্চাতে এবং গ্রীবার চতুর্দিকে); পার্শ্বদেশস্থ চর্মে বড় বড় গুটিকা থাকে। বৃহৎ ও গুরুভার দেহ, ক্ষুদ্র গ্রীবা, নৌকার আকৃতি মস্তক, তিন অঙ্গুলিবিশিষ্ট খর্ব ও স্থূল পদ এবং বড় বড় পাটে বিভক্ত ঢালের ন্যায় কঠিন ও স্থূল চর্ম দেখিয়া অন্য সকল জাতীয় জন্তু হইতে গণ্ডারের পার্থক্য সহজেই উপলব্ধি হয়। ভূচর স্তন্যপায়ী প্রাণীদের মধ্যে একমাত্র হস্তী ব্যতীত এত বৃহৎ প্রাণী আর জগতে নাই।

গণ্ডার নদীনালা ও জলাবিশিষ্ট নলবন বা তদ্রূপ উচ্চ (২০ ফুট পর্যন্ত) তৃণ-জঙ্গলে বাস করে। জলাভূমিতে গড়াগড়ি দিতে ইহারা ভালবাসে এবং দিনের অনেকটা সময় এইভাবে কাটায়। একটি নির্দিষ্ট স্থানে প্রত্যহ একই সময়ে মলত্যাগ করা ইহার স্বভাব। মলের স্তূপ যতদিন পর্যন্ত সমধিক উচ্চ না হয়, ততদিন একই স্থানে মলত্যাগ করে। ঐ স্থানে গমন করিবার সময় পিছন দিকে হাঁটিয়া যায়। এই স্বভাবের সুযোগ লইয়া গুপ্তশিকারীরা গণ্ডার হত্যা করে। হস্তীর ন্যায় ইহারাও সাধারণত নির্দিষ্ট ও সুচিহ্নিত পথ দিয়া গমনাগমন করে।

গণ্ডার সাধারণত অতি নিরীহ প্রাণী এবং কৃষি-ক্ষেত্রের বা কাহারও কোন অনিষ্ট করে না। কিন্তু কোন কারণে বিরক্ত হইলে ইহা প্রচণ্ডবেগে আক্রমণ করে; তবে নিজ গমনপথ ত্যাগ করে না। ইহার দৃষ্টিশক্তি কম। এই দুই কারণেই মনুষ্য অধিকাংশ ক্ষেত্রে গণ্ডারের আক্রমণ হইতে আত্মরক্ষা করিতে সমর্থ হয়, একান্ত সম্মুখে পড়িলে কিংবা হতবুদ্ধি হইয়া উহার গমনপথের উপর থাকিলে, মৃত্যু অনিবার্য। আমি একবার গণ্ডার কর্তৃক আক্রান্ত হইয়া উহার পথ ছাড়িয়া তাহার পার্শ্বে মাত্র ৩-৪ হাত দূরে স্থিরভাবে দাঁড়াইয়া ছিলাম, গণ্ডারটি তীরবেগে আমার সম্মুখ দিয়া অল্পদূর গমন করিয়া তৎক্ষণাৎ আবার আমার সম্মুখ দিয়া স্বস্থানে প্রত্যাগমন করিয়াছিল; সময় থাকিতে উহার পথ ছাড়িয়াছিলাম বলিয়াই সে-যাত্রা আমার জীবন রক্ষা পাইয়াছিল। গণ্ডারের দেহ দুর্বল হইলেও, ইহা প্লুত বা অর্ধপ্লুত ভঙ্গিতে দ্রুতবেগে দৌড়াইতে পারে। ১৯৩০-৩১ হইতে ১৯৩৯-৪০ সাল পর্যন্ত দশ বৎসরে বঙ্গদেশে মোট তিনজন মনুষ্য গণ্ডার কর্তৃক নিহত হইয়াছিল।

গণ্ডারের প্রধান খাদ্য তৃণ। ইহারা প্রাতে, সন্ধ্যায় ও প্রায় সমস্ত রাত্রিকালে আহার করে এবং দিনমানে অধিকাংশ সময় কর্দমাক্ত জলায় পড়িয়া থাকে ও নিদ্রা যায়। ইহাদের সাধারণত একাকী বিচরণ করিতে দেখা যায়, কিন্তু স্বল্পস্থানের মধ্যে সচরাচর অনেকগুলি থাকে।

গণ্ডারের কোন নির্দিষ্ট প্রজননঋতু নাই। ইহার গর্ভধারণের কাল কমবেশি ১৮ মাস। এককালীন একটিমাত্র শাবক ভূমিষ্ঠ হয়। ইহারা শতাধিক বৎসর জীবিত থাকে বলিয়া শুনা যায়।

গণ্ডারের মাংস নাকি অতি সুস্বাদু। নেপালী রাজবংশীদের বিশ্বাস যে, গণ্ডারের মাংস দেবতাদের প্রিয় এবং ইহা আহার করিলে চৌদ্দপুরুষ উদ্ধার হয়। ইহার প্রস্রাব ক্ষতের পচন নিবারক বলিয়া গণ্য। ব্যাধি ও ভূতপ্রেতের প্রতিরোধকল্পে পাহাড়ীরা গণ্ডারের প্রস্রাবে পূর্ণ একটি পাত্র তাহাদের গৃহের প্রবেশপথে ঝুলাইয়া রাখে। হিন্দু শাক্তগণ গণ্ডারের চর্মে নির্মিত কোষা কুশি পূজার জন্য প্রশস্ত মনে করে। চীনদেশীয় লোকদের বিশ্বাস, ইহার শৃঙ্গ পুরুষত্বহীনতার মহৌষধ; ইহার এইরূপ গুণ আছে কিনা সে বিষয়ে সন্দেহ করিবার যথেষ্ট কারণ থাকা সত্ত্বেও, অনেকে ইহার জন্য অত্যধিক মূল্য দিতে প্রস্তুত। এক-একটি গণ্ডার শৃঙ্গ কলিকাতা বাজারে দুই হাজার টাকারও অধিক মূল্যে বিক্রয় হইতে দেখা গিয়াছে। এইরূপ অত্যধিক মূল্যের জন্য কয়েক বৎসর পূর্বে (১৯২৭-২৮ সাল হইতে) কিছুকালের জন্য বঙ্গদেশে গুপ্ত শিকারীর অত্যাচার অত্যন্ত বৃদ্ধি পাইয়াছিল; তাহারা জলপাইগুড়ি জেলাস্থ সরকারী জঙ্গলে অনধিকার প্রবেশ করিয়া অনেকগুলি গণ্ডার হত্যা করে। ইহাকে প্রায় নির্বংশ করিয়া ফেলিয়াছিল।

সেইজন্য উহার রক্ষাকল্পে ১৯৩২ সালে বঙ্গ গণ্ডার-সংরক্ষণ (৮ম) আইন নামে একটি বি